রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি অগ্রন্থিত চিঠি

সংকলন ও ভূমিকা : ভূঁইয়া ইকবাল*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত চিঠি লিখেছেন, তার সংখ্যা এখনো নির্ণয়ের অপেক্ষায় আছে। এক হিসেবে কবির সাড়ে সাত হাজার বাংলা চিঠির হদিস পাওয়া গেছে (গৌরচন্দ্র, ২০১৮ : ১–৯২৭)। এসব চিঠির সিংহভাগই নানা সাময়িকপত্রে, সংকলনে কিংবা অন্যদের বইয়ে সংকলিত/উদ্বৃত। বাংলা লেখা চিঠির বাইরে আছে ইংরেজিতে লেখা অসংখ্য পত্র।

বেশ কিছু চিঠি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন আরকাইভসে সংরক্ষিত, যেগুলো এখনো প্রকাশ লাভ করেনি। এছাড়া রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়নি; প্রাপক বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছেও অনেক চিঠি আছে, যেগুলোর কোন হদিস নেই। বিদেশে নানা গ্রন্থাগারে ও আরকাইভ্সে সংরক্ষিত, যেগুলো এখনো প্রকাশ লাভ করেনি। এছাড়া রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়নি; প্রাপক বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছেও অনেক চিঠি আছে, যেগুলোর কোনো হদিস নেই।

বিদেশে নানা গ্রন্থাগারে ও আরকাইভ্সে কবির চিঠি সংরক্ষিত, যার কিছু-কিছুর প্রতিলিপি, আমার জানামতে, মার্টিন কেম্পশ্যেন ও উমা দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেক রবীন্দ্রানুরাগী রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়েছেন। আমি নিজেও মুনীর রানার সহযোগিতায় ইন্টারনেট থেকে কয়েকটি চিঠি রবীন্দ্রভবনকে দিয়েছি।

প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, রবীন্দ্রবীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা ইত্যাদি অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকায় অপ্রকাশিত রবীন্দ্রপত্র প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকাতেই কবির দু-হাজার দু-শো চিঠি মুদ্রিত হয়েছে (১৯৩৩–৯২)।(শ্যামাপ্রসাদ, ১৯৯০)

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে কবির জীবিতকালেই কয়েকটি পত্রসংকলন বেরিয়েছে : *ছিন্নপত্র* (১৩১৯ ব.), *ভানুসিংহের পত্রাবলি* (১৩৩৬ ব.) এবং *পথে ও পথের প্রান্তে* (১৩৪৫ ব.)। কবির প্রয়াণের পর বিশ্বভারতী চিঠিপত্র নামে পত্রসংগ্রহের প্রকাশের সূচনা করে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। ঊনবিংশ খণ্ডের প্রকাশকাল ১৪১১। ৬২ বছরে বিশ্বভারতীর মাত্র উনিশটি খণ্ড মুদ্রণের কৃতিত্ব। বিগত ১৫ বছরে বিশ্বভারতী কয়েকটি খণ্ডের পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাপালেও তাদের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়– একথা বলা যাবে না। বিশ্বভারতী রবিন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রকাশনায় সামর্থ্যহীনতা প্রমাণ করে ক্ষান্ত হয়নি। রবীন্দ্রভবনের দু-এক জন কর্মী অন্যদের কাজেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন। যেমন, একবার হুকুম জারি করা হয় যে, কবির কোনো লেখার একটি লাইনও অনুলিপি করা যাবে না। কপিরাইট সংক্রান্ত বাধা দূর হওয়ার পর অন্যান্য প্রকাশক এগিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রপত্র প্রকাশনায়।

বিশ্বভারতীর উনিশ খণ্ড ছাড়াও প্রকাশ পেয়েছে কুণাল সিংহ-সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের চিঠি : পারুল দেবীকে* (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭); আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০০); প্রমথনাথ বিশীকে লেখা পত্রাবলি *শুভাকাঙ্ক্ষী* (রবীন্দ্রভাবনা, বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৯); প্রশান্তকুমার পাল-সম্পাদিত *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৪১১ ব.); অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত *নিজের কথা* (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৮); সমীর সেনগুপ্ত-সম্পাদিত *বিদ্বজ্জনেদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি* (কলকাতা : পত্রলেখা, ২০১১); গৌরচন্দ্র সাহা-সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের চিঠি/ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে* (কলকাতা : পত্রলেখা, ২০১৩); রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ভক্ত ও *কবি* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭); বাংলা একাডেমি-প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র* (ঢাকা, ১৯৮৪) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রপত্র সংকলন ও সম্পাদনায় অনাথনাথ দাস, আনিসুজ্জামান, আবুল আহসান চৌধুরী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ কুণ্ডু, কানাই সামন্ত, কুনাল সিংহ, গোপালচন্দ্র রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সরকার, পুলিন বিহারী সেন, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, উমা দাসগুপ্ত, চিন্ময় গুহ, প্রশান্তকুমার পাল, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সলিম ঘোষ, সুতপা ভট্টাচার্য, চিত্রা দেব, সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুনীল দাস, সনৎকুমার বাগচী, ভবতোষ দত্ত প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন।

কবিপ্রয়াণের পর বিশ্বভারতী খণ্ডে-খণ্ডে *চিঠিপত্র* নামে পত্রসম্ভার প্রকাশের উদ্যোগ নেয় (১৩৪৯ ব.)। প্রথম খণ্ডের সূচনায় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন : রচিয়তার চিরন্তন অধিকার বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত প্রথম মুদ্রিত তিনটি পত্র সংকলনের "বহু পত্রের বহু স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন।" পরে প্রকাশিত পত্র সংকলনে পরিবর্তন-পরিবর্জনের ধারা বর্জিত হয় বলে দাবি করলেও দেখা যায়, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা মুসোলিনি সম্পর্কে একটি চিঠি ছাপার পর ওই দ্বিতীয় খণ্ড বাজার থেকে প্রত্যাহার ও বিক্রয়-বিতরণ বন্ধ করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ড *চিঠিপত্রে*র পরবর্তী মুদ্রণে চিঠিটি বাদ পড়ে। পুলিনবিহারী সেন একটি চিঠিতে আয়েত আলী খান সম্পর্কে কবির প্রতিকূল মন্তব্য থাকায় ওই চিঠি সংকলন করেননি।

বিশ্বভারতীর প্রকাশিত *চিঠিপত্র* পত্রমালার প্রথম খণ্ডে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, দ্বিতীয় খণ্ডে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ডে পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, চতুর্থ খণ্ডে কন্যা মাধুরীলতা, মীরা, দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী, পঞ্চম খণ্ডে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রাদি সংগৃহীত।

এখনো কবির অনেক চিঠি নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে অগ্রন্থিত অবস্থায় লোকলোচনের আড়ালে রয়ে গেছে। এখানে কয়েকটি অগ্রন্থিত চিঠি সংগ্রন্থিত হলো। এসব চিঠির রচনাকাল বিশ শতকের প্রথম তিন দশক। প্রথমটি লেখা হয় ১৯০২ সালে, শেষটি ১৯৩০-এ। প্রথম চিঠির প্রাপক ত্রিপুরার প্রিন্স ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ; দ্বিতীয়, সপ্তম-অষ্টম পত্রের প্রাপক রবীন্দ্রকাব্যের অখণ্ড সংস্করণের (১৯০৩) সম্পাদক ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনালগ্নের অধ্যক্ষ (১৯০৪) মোহিতচন্দ্র সেন, তৃতীয়–পঞ্চম চিঠি লিখেছেন কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, শ্রীনিকেতনের এক সময়ের অধ্যক্ষ, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে; নবম পত্র এক সময়ের কলাভবনের অধ্যক্ষ, শান্তিনিকেতনের সচিব সুরেন্দ্রনাথ করকে।

শ্রীনিকেতনে কবির সহায়ক উইলিয়াম পিয়র্সনকে লেখেন ১৯১৩-র ৬ আগস্ট। একটির প্রাপকের নাম ও তারিখ উল্লেখ নেই।

সব চিঠিরই কেন্দ্রীয় বিষয় কবি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা।

পত্রাবলি

পত্র : এক

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই– তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হোক অন্তরে সেই দিক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ় রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বানিজ্যব্যবসায় আসবাব-আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। ২৪ শে চৈত্র ১৩০৮।

(ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণকে লিখিত।)

প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চ্চা, অশনবসন, চরিত্রচর্চ্চা, ভক্তিসাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখবেন– আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন, প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের সর্ব্বাংশের সম্বন্ধ থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা- বলা সহজ, করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল। হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয় কলের সাহায্যে নয় এইটে আদত কথা। কলিকাতা, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

(মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত।)

পত্র : দুই

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois.
U.S.A

কল্যাণীয়েষু,

সন্তোষ, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পাওয়া গেল। তুমি ছেলেদের নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়েছিলে শুনে খুব খুশি হলুম। ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের যোগ যত ব্যাপক হয় ততই ভালো। আমি দূরে এসে আমাদের বিদ্যালয়ের আনন্দচ্ছবি আরো যেন নিবিড় করে দেখতে পাচ্চি। যত দিন যাচ্চে ওখানে মধু জমে উঠ্‌ছে; কারণ মানুষের জীবন আপনার সমস্ত সঞ্চয় আপনার মধ্যেই তো সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলে না; তার উদ্বৃত্ত অনেক; যেখানে সে থাকে সেখানে তো আপনার অনেকটা প্রাণসামগ্রী ছড়িয়ে ফেলে জড়িয়ে তোলে; সে সমস্তই অহরহ জমে জমে ওঠে; বিশেষত মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন তার জীবনের এই বাড়তি জিনিষ আরো বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হোতে থাকে। আমাদের ওখানে দেড়শো দুশো ছেলের প্রাণের

আনন্দ প্রতিদিনই নানাভাবে ওখানকার বাতাসের সঙ্গে মাটির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে– ওখানে একটি অদৃশ্য আনন্দনিকেতন সৃষ্টি করে চলেছে– কত তরুণ হৃদয়ের রঙীন সূতোয় ওখানে একটি অপরূপ চাঁদোয়া বুনে চলেছে; তার শোভা যে কী আশ্চর্য্য তা একটু দূরে থেকে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। ওখানকার এই সৃষ্টিকার্য্য যে কী সুদূরব্যাপী ও সুমহৎ তা অভ্যাসের জড়ত্ববশত একদিনো যেন তোমরা ভুলে যেয়ো না– তোমরা সত্য হও এবং চারিদিকে উৎসারিত হতে থাক– প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা তোমাদের ধ্যানদৃষ্টি যেন আবৃত না হয়– বাধা বিরুদ্ধতাকেই তোমরা যেন বড়ো করে দেখো না। ৭ই পৌষ উত্তীর্ণ হয়েছে– তোমরা নূতন বৎসরে প্রবেশ করেছ– এবার আর একবার তোমাদের সত্যরূপকে মনের সামনে নির্ম্মল করে উজ্জ্বল করে সুস্পষ্ট করে দেখো, তার আনন্দ মূর্ত্তির সামনে প্রাণপাত করে আর একবার নতুন করে তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করো, অন্তরের মধ্যে কোথাও কোনো ভীরুতা কোনো সংকোচ রেখো না, এবং বাইরের দিকে যে সমস্ত কর্ম্মের আবর্জ্জনা জমেছে সেগুলোকে যতদূরে পারো ঝাঁট দিয়ে ফেলে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে মুক্ত কর এবং সুন্দর করে তোলো। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

ইতি স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত)

পত্র : তিন

ওঁ

C/o. Messrs Thomas Cook and Son
Ludgate Circus, London
২৩শে বৈশাখ ১৩২০

কল্যাণীয়েষু–

সন্তোষ, তোমরা এখন ছুটি ভোগ করচ। হয়ত ২০ শে জ্যৈষ্ঠের কাছাকাছি আমার এই চিঠি পাবে। সেখানকার সেই রৌদ্রদগ্ধ মাঠের উপর খরতর গ্রীষ্মের মূর্ত্তিটি কি রকম তা ঠিকটি এখানে উপলব্ধি করাই শক্ত। কেননা আজ ২৩ শে বৈশাখে এখনো আমাদের ঘরে আগুন জ্বলচে। আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, মোটা কাপড়গুলোর বোঝা এখনো নামাতে পারিনি। এখানে মানুষকে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যেই প্রস্তুত হতে হয়, সহজে কিছু হবার জো নেই। আমাদের দেশে প্রস্তুত না হওয়াটাই হচ্ছে দরকার, গায়ের চাদরটা পর্য্যন্ত খুলে ফেললে তবে প্রাণ বাঁচে। সেই অভ্যাসের মানুষকে এ সব দেশে ধরে রাখা বড়ো নাকাল।

ক্ষিতিমোহন বাবুকে এ দেশে আনবার আয়োজন আমি ঠিক করেই রেখেছি। আর একটু হলে এই গরমির ছুটির পরেই তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা করছিলুম। কিন্তু আমার হঠাৎ এই সুবুদ্ধি এল যে আমি ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁকে বিদ্যালয় থেকে তুলে আনা উচিত হবে না। তোমাদের ওখান থেকে এখন অনেক পুরাতন শিক্ষক চলে এসেছেন, অনেক নূতন লোক নিযুক্ত হয়েছেন। এই নূতন আগত আগন্তুকদের আমাদের আশ্রমের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে

নেবার জন্যে পুরাতন ধারাটিকে প্রবল রাখা দরকার। নইলে ইস্কুলের ভাবটিই আশ্রমের ভাবটিকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চাইবে। ইস্কুলে যাঁরা পড়াচ্চেন তাঁদের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু আশ্রমে যাঁরা সাধনা করচেন তাঁদের প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। সে প্রয়োজনটাকে চোখে দেখা যায় না এবং হিসাবের খাতার মধ্যে ধরে দেখানো শক্ত, তাতে তোমাদের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ফলের কোনো তারতম্য হবেনা, কিন্তু তার ওজন নেই বলে যে তার প্রয়োজন নেই তা নয়। আমাদের বিদ্যালয়ে যে জিনিষটা দেখা যায় না সেইটেই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। সন্তোষ, সেইটিকে তোমরা স্পষ্ট করে দেখ, সেইটির প্রতি তোমাদের বিশ্বাসকে অবিচলিত করে ধরে রাখ এবং, তার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবশতই তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ছোট খাটো খিটিমিটি গুলোকে কাটাগাছের মত একেবারে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে দাও। আপনাকে জয় করার দ্বারাই চারিদিকের সকলকে জয় কর। তোমরা সকলে এখনো মনে প্রাণে সম্পূর্ণ মিলতে পারনি এইখানেই তোমাদের গভীর দীনতার পরিচয় রয়ে গেছে।

যখন ক্ষিতিমোহন বাবুকে বিদ্যালয় থেকে কিছুকালের জন্যেও চলে আসতে হবে তখন শাস্ত্রী মশায়কে ফিরে পেতে পারলে আমাদের উপকার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়ত আগামী পূজোর ছুটির পরে তাঁকে দরকার হবে। এখন থেকে এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কতকটা এগিয়ে রেখে দিলে ভাল হয় না? তা হলে আগে থাকতে তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবেন।

তোমাদের বিদ্যালয়ের ব্যয় সংক্ষেপের জন্যে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছ তাতে খুব উপকার হবে আশা করচি। কেননা, এ উপকারটা ভিতরের দিকের উপকার। ব্যবস্থার শৈথিল্যে যে কেবলমাত্র অপব্যয় ঘটে তা নয় মনের উপর নিয়ত তার দৃষ্টান্তের ফল অত্যন্ত খারাপ। ও জিনিষটা একেবারে বিষের মত চরিত্রের মূলে গিয়ে আঘাত করে । এ দেশে ঘরে দ্বারে পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই যে একটি জাগ্রত উদ্যোগকে দেখতে পাই তাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। কেন না এই শক্তির পিছনেই সৌন্দর্য্য– উদ্যোগিনঃ পুরুষ সিংহমুপৈতী লক্ষ্মীঃ– এরই সহচর হচ্চে সুখ স্বাস্থ্য কল্যাণ। একবার আমাদের দেশের বাবুদের কর্ম্মশালা এবং আমাদের গিন্নিদের ঘরকরনার কথা স্মরণ করে দেখ। সর্ব্বদাই গোলমাল চলচে অথচ শোভা নেই শৃঙ্খলা নেই। যেখানে বাস করচি সেখানে অযত্ন মূর্ত্তিমান, অথচ নাবার খাবার সময় নেই। নাকের সামনেই দুর্গন্ধ, চোখের সামনেই কুদৃশ্য। নিজেকে আমরা যেন চব্বিশ ঘণ্টা অপমান করচি। আমরা পরের কৃত অবমাননায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করি। কিন্তু অহোরাত্র আত্মাবমাননার হাত থেকে যে দিন আমরা নিজেদের উদ্ধার করব সেই দিন আমরা রক্ষা পাব। বিদ্যালয়ে আহারশালায় শয়নাগারে মাঠে ঘাটে আমরা ভদ্রতাকে যে বিধিমতে লাঞ্ছিত করচি সেইটে থেকে যদি বিদ্যালয়কে বাঁচাতে পার তাহলে দেখবে ব্যয় সংক্ষেপও হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও বিকাশ ঘটবে। বিদ্যালয়ে সম্প্রতি খুব একটা অস্বাস্থ্যের আমদানি হয়েছে এটার সঙ্গে কি কোমর বেঁধে লড়াই করবে না। যেখানে যেখানে একটুও জল জমচে জঞ্জাল জমচে সেখানে দৃষ্টি দাও– তোমরা নিজের হাতে যা করতে পার সেই দিকে চেষ্টা প্রবর্তন কর– আরো বেশি টাকা আরো বেশি সুবিধার জন্যে দুর্ব্বলভাবে অক্ষমভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকোনা। কোমর বেঁধে দাড়াও, ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটাও, কোদাল দিয়ে কোপাও, জল দিয়ে ধোও, আগুন দিয়ে পোড়াও, দুদিনের আকস্মিক উৎসাহ নয় প্রতিদিনের অক্লান্ত উদ্যমকে জাগিয়ে রাখ। তোমরা দুশো লোকে যদি মন দাও তা হলে কি যে না করতে পার তা ত ভেবে পাইনে। তোমরা ভূবনডাঙার উপকার এবং সাঁওতালপাড়ার উন্নতি করতে চাও কিন্তু যখন তোমাদের নিজের শ্রীহীনতার দিকে তাকাও

তখন নালিশ করতে থাক যথেষ্ট মালি নেই মজুর নেই টাকা নেই। নেই যেটা সেটা হচ্চে চিত্ত,– বিত্ত নয়, সেই চিত্তকে সম্পূর্ণ সজাগ করে তোলবার জন্যেই বিধাতা তোমাদের দুঃখ দিচ্চেন–সেই জন্যেই তোমাদের তহবিল শূন্য, তোমাদের হাসপাতাল পূর্ণ। এ জন্যে তোমরা তোমাদের প্রত্যেককে দায়ী করে প্রত্যেকের উপরে দায়িত্ব দাও– প্রত্যেকে যদি একটুখানি করেও ভার নেয় তাহলে বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড ভার লাঘব হয়। ইতি

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।)

পত্র : চার

ওঁ

508 High St.
Urbana, Ill.

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, ঘোরাফেরা সেরে আবার কাজে বসতে হবে। এবার আমাকে একটু বিশেষ উঠে পড়ে লাগতে হবে– অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করবার আছে। তোমাদের চিঠির বরাদ্দ হয় ত কিছু কমিয়ে আনার প্রয়োজন হবে। দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কি করা যাবে তারই নানা সংকল্পে মন প্রতিদিন পূর্ণ হয়ে উঠচে। অবশ্য সংকল্পের মুকুল যত ধরে ফল তত ফলে না কিন্তু তবু এই মুকুল ধরানোর বসন্ত-উৎসবও ত কম আনন্দের নয়। সিউড়ির মেলাতে জয় লাভ করে তোমরা পুরস্কৃত হয়ে এসেছ শুনে আমি খুব খুসি হলুম। তোমার গোপালগুলিও গুণিজনের সম্বর্দ্ধনালাভ করে তোমার গোষ্ঠের মুখোজ্জ্বল করেছে এও শুভ সংবাদ। তোমাদের ছেলেরা সবজির বাগান করেছে এ খবরটি পেয়ে আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি যখন ফিরে যাব তখন আশা করচি আমি দেখতে পাব আমাদের বিদ্যালয়ের চারিদিকের ভূমি প্রসন্ন এবং গাছপালা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে– তখন আশ্রমের কোথাও কোনো অনাদরের চিহ্ন দেখতে পাব না। ততদিনে তোমাদের রাস্তাগুলি পরিপাটি এবং গাছের তলা পরিষ্কৃত হয়ে গেছে। সব চেয়ে আমি আশা করে আছি আমাদের আশ্রমবাসীদের সমস্ত দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি সুবিহিত সুশৃঙ্খল হয়ে এসেছে। ছাত্ররা যাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কর্ম্মকে প্রণালীবদ্ধ করে তুল্‌তে পারে সেইদিকে তাদের উৎসাহিত কোরো। বাইরের শাসনে নয় কিন্তু নিজের কর্ত্তৃত্বে তারা সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করবে এইটেই সব চেয়ে প্রার্থনীয়। কি করলে সব চেয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে এই সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই দাও এবং তাদের ব্যবস্থামত চলবার জন্যে তোমরাও প্রস্তুত হও। সমস্ত জিনিষ গড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাক– কেননা এই গড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা, এবং এটা বিশেষভাবে ছাত্রদেরই জন্যে আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে তোমরা কোনো সঙ্কোচ রেখো না– এই ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীকে যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে সে একটি মস্ত জিনিষ হবে। শিবাজি যেমন তাঁর গুরুর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর রাজ্যভার ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি আমাদের ছাত্ররা গুরুর প্রতিনিধি হয়ে বিনম্রভাবে যখন শাসন বিস্তার করতে শিখবে তখন আমরা ধন্য হব। প্রথমে অনেক বাধা

ও বিশৃঙ্খলতা ঘটতে পারে কিন্তু তাতে তোমরা ভয় কোরো না– ভুল করতে দাও তাহলেই ভুল সমূলে নষ্ট হবে– ভুল থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভুলকেই বাঁচিয়ে রাখা হয় একথা নিশ্চয় মনে জেনো।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।)

পত্র : পাঁচ

ভারতবর্ষে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো সঙ্গতি না থাকে তবে মনটা নিতান্তই থাকা চাই তা যদি থাকে তবে এমন পুণ্যস্থান আর নেই। তাই আমাদের প্রত্যেকের উপরে ভারতবর্ষের এই দাবী যে ভারতবাসীর মনকে জাগাও, প্রাণবান সর্বত্রগামী আনন্দময় মনকে বিশ্বের অভিমুখে পূর্ণ বিকশিত করে তোলো– কারখানা ঘরে তাদের মজুরী যদি না জোটে হাটবাজারে তাদের মূল্য যদি না মেলে বিশ্বে তাদের চেতনা যেন সংকীর্ণ না হয়। ভাগ্য তাদের চারিদিকেই বঞ্চনা করেছে এইজন্যে যাতে তারা নিজের অন্তরতম সহজ সম্পদকে নিজের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পারে এজন্যে তাদের শিশুকাল থেকে উদ্যোগী করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয় যেন সেই শুভ চেষ্টার স্থান হয় এই কথা তোমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ওখানকার ছোট বড় প্রত্যেক কাজই যেন জীবনের কাজ হয় এই আমার ইচ্ছা। কল সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে– আমাদের ছেলেগুলোকে পিণ্ড পাকিয়ে সেই কল রাক্ষসের নৈবেদ্যরূপে যেন সাজিয়ে না দিই তাদের বাঁচিয়ে তোল, বাঁচিয়ে রাখ– বিশ্বজগতে তারা যেন নিজের জীবন দিয়ে গ্রহণ করে জলেস্থলে আকাশে এবং বৃহৎ লোকালয়ে তারা যেন নিজের প্রাণের আলিঙ্গন বিস্তীর্ণ করে দিতে পারে, তাদের অনুভূতির প্রবাহ কোথাও থেকে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে না আসে। তাদের পুড়িয়ে গলিয়ে পিটিয়ে ইস্কুলের ছাঁচে ঢেলে যেন কলের পুতুল ক'রে তুলো না। সে রকম পুতুল তৈরির কারখানা অসংখ্য আছে আমাদের বিদ্যালয় তা নয় বলেই যেন আমরা গৌরব করতে পারি। সভ্যজগতে আজ এই মস্ত একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে সজীব মানুষ অন্য দিকে সভ্যতার কল এই দুয়ের মধ্যে কার জিত হবে? এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটছে না। কিন্তু এ কথা তো ভুললে চলবে না যে মানুষই কলকে চালাবে, কল তো মানুষকে চালাবে না। অতএব মানুষের শিক্ষা যদি কলের শিক্ষা হয় তাহলে মনুষ্যত্বের গোড়ায় কোপ মারা হয়। এই বিপদের কথা লোকে বুঝতে পারছে কিন্তু কী করলে এর কিনারা হতে পারে তা কেউ ভেবে পাচ্ছে না।

আমরা ভূমার বক্ষের মধ্যে ছেলেদের মানুষ করে তোলবার আয়োজন করছি এই কথাটা যেন সর্বতোভাবে সত্য হয়– আমাদের তপোবন থেকে কলকে খেদাও, ওখানে প্রাণকে আন। ইতি ৩০ শে জানুয়ারি ১৯১৩

(শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে লিখিত।)

পত্র : ছয়

আমার মনে হচ্চে ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্যে কিছুমাত্র ভাবতে হয় না যদি তাদের best sauce এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব কসে পরিশ্রম করিয়ে ক্ষুধার মুখে বেশ শাদাসিধা খাবার দিলে সেটা রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর হবেই। পূর্বে ওরা যখন সকালে বিকালে খুব কসে কোদাল পাড়ত তখন খাবার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত না এবং মোটা রুটি ও ডাল আশ্চর্য পরিমাণে খেতে পারত। ওদের শরীর তখন এখনকার চেয়ে ভাল ছিল। আমার তাই মনে হচ্চে সকালে কোনো এক সময়ে অন্তত দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখবেন। বিকালে যে সব ছেলে ফুটবল না খেলবে তাদেরও এই রকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ পরিশ্রম কালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে কোন অসুখ করেনা, বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। দুই একজন ছেলের এক আধদিন একটু আধটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ কড়া রৌদ্রটা খালি মাথায় ভাল নয়, রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তাহলে কোন ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি গা ভাল করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সতর্ক হতে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসায়। দু একটি করে ছেলেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুতপথ চালনা করে চলবেন, দুচারদিন এমন করলেই রৌদ্রবৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোটা নানা কারণে বিশেষ হিতকর। ইতি ১৮ই আষাঢ়

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত)

পত্র : সাত

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই আমি সব চেয়ে গুরুতর বলে মনে করি। আপনাকে যেমন করে হোক শিক্ষক তৈরি করে নিতে হবে। আপনার চালনা অনুসারে শিক্ষকেরা কাজ করে যাবে– আপনি তাদের কাজ সর্বদাই পরীক্ষা করবেন। পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেও ভেবে রাখবেন। যে সমস্ত বই তৈরি করা আবশ্যক তার প্রতিও কি দৃষ্টি দেবেন না?

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত)

পত্র : আট

একটা কথা মনে রেখো, আমি নন-কো-অপারেশনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মত প্রচার করতে চাইনে। ও-সমন্ধে তোমাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে তাতে লেশমাত্র ক্ষতি নেই– কেবলমাত্র কথা এই– আমাদের শান্তিনিকেতন পলিটিক্সের বাইরে। ৬ই মে ১৯২১

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত)

সহায়কপঞ্জি

গৌরচন্দ্র সাহা (২০১৮)। *রবীন্দ্রপত্র প্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী*। আশাদীপ, কোলকাতা।
শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)। 'অগ্রন্থিত রবীন্দ্র-পত্রাবলী : একটি সমীক্ষা'। *দেশ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯০ এবং *দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।